

ছোট গল্প

মুক্তকুন্তলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আমার খুদে বন্ধুরা এসে হাজির তাদের নালিশ নিয়ে। বললে, দাদামশায় তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ মনে কর।

তা, ভাই, ঐ ভুলটাই তো করেছিলুম। আজকাল নিজেরই বয়েসটার ভুল হিসেব করতে শুরু করেছি।

রূপকথা আমাদের চলবে না, আমাদের বয়েস হয়ে গেছে।

আমি বললুম, ভায়া, রূপকথার কথাটা তো কিছুই নয়। ওর রূপটাই হল আসল। সেটা সব বয়েসেই চলে। আচ্ছা, ভালো, যদি পছন্দ না হয় তবে দেখি খুঁজে-পেতে। নিজের বয়েসটাতে ডুব মেরে তোমাদের বয়েসটাকে মনে আনতে চেষ্টা করছি। তার থলি থেকে রূপকথা নাহয় বাদ দিলুম, তার পরের সারে দেখতে পাই মৎস্যনারীর উপাখ্যান। সেও চলবে না। তোমরা নতুন যুগের ছেলে, খাঁটি খবর চাও; ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসবে, লেজা যদি হয় মাছের, মুড়ো কী করে হবে মানুষের; রোসো, তবে ভেবে দেখি। তোমাদের বয়েসে, এমন-কি তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়েসে আমরা ম্যাজিকওয়াল হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলুম। শুধু তাঁর ম্যাজিকে হাত ছিল না, সাহিত্যেও কলম চলত। আমাদের কাছে সেও ছিল ম্যাজিক-বিশেষ। আজও মনে আছে একটা ঝুলঝুলে খাতায় লেখা তাঁর নাটকটা, নাম ছিল মুক্তকুন্তলা। এমন নাম কার মাথায় আসতে পারে! কোথায় লাগে সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী। তার পর তার মধ্যে যা সব লম্বা চালের কথাবার্তা, তার বুলিগুলো শুনে মনে হয়েছিল, এ কালিদাসের ছাপ-মারা মাল। বীরাজনার দাপট কী! আর দেশ-উদ্ধারের তাল ঠোকা! নাটকের রাজপুত্রটি ছিলেন স্বয়ং পুরুরাজের ভাগ্নে; নাম

ছিল রণদুর্ধর্ষ সিং। এও একটা নাম বটে, মুক্তকুন্তলার নামের সঙ্গে সমান পাঁয়তারা করতে পারে। আমাদের তাক লেগে গেল।

আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন ভারত জয় করতে। রণদুর্ধর্ষ বিদায় নিতে এলেন মুক্তকুন্তলার কাছে। মুক্তকুন্তলা বললেন, যাও বীরবর, যুদ্ধে জয়লাভ করে এসো, আলেকজাণ্ডারের মুকুট এনে দেওয়া চাই আমার পায়ের তলায়। যুদ্ধে মারা পড়লেও পাবে তুমি স্বর্গলোক, আর যদি বেঁচে ফিরে এস তো স্বয়ং আছি আমি।

উঃ, কতবড়ো চটাপট হাততালির জায়গা একবার ভেবে দেখো। আমি রাজি হলেম মুক্তকুন্তলা সাজতে, কেননা, আমার গলার আওয়াজটা ছিল মিহি।

আমাদের দালানের পিছন দিকে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তাকে বলা হত গোলাবাড়ি। সত্যিকার ছেলেমানুষের পক্ষে সেই জায়গাটা ছিল ছুটির স্বর্গ। সেই গোলাবাড়ির একটা ধারে আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘর, লোহার গরাদে দেওয়া; সেই গরাদের মধ্যে হাত গলিয়ে বস্তার ফাঁকের থেকে ডাল চাল কুড়িয়ে আনতুম। ইঁটের উনুন পেতে কাঠকোট জোগাড় করে চড়িয়ে দিতুম ছেলেমানুষি খিচুড়ি। তাতে না ছিল নুন, না ছিল ঘি, না ছিল কোনোপ্রকার মসলার বালাই। কোনোমতে আধসিদ্ধ হলে খেতে লেগে যেতুম। মনে হয় নি ভোজের মধ্যে নিন্দের কিছু ছিল। এই গোলাবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে গোটাকতক বাখারি জোগাড় করে হ. চ. হ., আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার, নানা আয়তনের খবরের কাগজ পুরে জুড়ে একটা স্টেজ খাড়া করেছিলেন। স্টেজ শব্দটা মনে করেই আমাদের বুক ফুলে উঠত। এই স্টেজে আমাকে সাজতে হবে মুক্তকুন্তলা। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু হতভাগিনী মুক্তকুন্তলার দুঃখের দশা কিছু কিছু মনে

পড়ে। এইটুকু জানি, তিনি তলোয়ার হাতে বীরপুরুষের সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। কিন্তু, ঘোড়াটা যে কার সাজবার কথা ছিল সে ঠিক মনে আনতে পারছি নে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরললনা যে স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বুক যখন বর্শা (পাতকাঠি) বিদ্ধ হল, যখন মাটিতে তাঁর মুক্তকুন্তল লুটিয়ে পড়ছে, রণদুর্ধর্ষ পাশে এসে দাঁড়ালেন। বীরঙ্গনা বললেন, বীরবর, আমাকে এখন বিদায় দাও, হয়তো স্বর্গে গিয়ে দেখা হবে। আহা, আবার হাততালির পালা।

অভিনয়ের জোগাড়যন্ত্র মোটামুটি একরকম হয়ে এসেছিল। হরীশচন্দ্র কোথা থেকে এনেছিলেন নানা রকমের পরচুলো গোঁফদাড়ি। বউদিদির হাতে পায়ে ধরে দুটো-একটা শাড়িও জোগাড় করেছিলুম। তাঁর কৌটা থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথেয় পরবার সময় কোনো ভাবনা মনে আসে নি। স্কুলে যাবার সময় ভুলেছিলুম তার দাগ মুছতে। ছেলেদের মধ্যে মস্ত হাসি উঠেছিল। কিছুদিন আমার ক্লাসে মুখ দেখাবার জো রইল না। নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে ফল দেখা গেল এই হাসিতে। আর, বাকিটুকু হয়ে গেল একেবারে ফাঁকি। যেখানে আমাদের স্টেজের বাখারি পোঁতা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় সেজদাদা কুস্তির আখড়া পত্তন করলেন। মুক্তকুন্তলার সবচেয়ে দুঃখের দশা হল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, এই কুস্তির আড্ডায়। রণদুর্ধর্ষকে মিহি গলায় বলবার সুযোগ পেলেন না, হে বীরবর, স্বর্গে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে। তার বদলে বলতে হল, সাড়ে নটা বাজল, স্কুলের গাড়ি তৈরি।এর থেকেই বুঝবে, আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলাম সে ছিলাম খাঁটি ছেলেমানুষ।

*

* *

‘দাদা হব’ ছিল বিষম শখ—
তখন বয়স বারো হবে,
কড়া হয় নি তুক।
স্টেজ বেঁধেছি ঘরের কোণে,
বুক ফুলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
হয়েছিল দাদার অভিনয়;
কাঠের তরবারি মেরে
দাড়ি- পরা বিপক্ষে
বারে বারেই করেছিলুম জয়।
আজ খসেছে মুখোশটা সে,
আরেক লড়াই চারি পাশে—
মারছি কিছু অনেক খাছি মার।
দিন চলেছে অবিরত,
ভাবনা মনে জমছে কত,
ষোলো-আনা নয় সে অহংকার।
দেখছে নতুন পালার দাদা
হাত দুটো তার পড়ছে বাঁধা
এ সংসারের হাজার গোলামিতে।
তবুও সব হয় নি ফাঁকি,
তহবিলে রয় যা বাকি
কাজ চলছে দিতে এবং নিতে।
সাজ হয়ে এল পালা,
নাট্যশেষের দীপের মালা
নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

রঙিন ছবির দৃশ্য রেখা
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা,
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জমে।
সময় হয়ে এল এবার
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা।
খাতা হাতে এখন বুঝি
আসছে কানে কলম গুঁজি
কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা।
চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা
কোনোমতেই চলবে না তো আর।
অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে
পড়বে ধরা শেষ গণিতে
জিত হয়েছে কিংবা হল হার।